নাটকীয়তা সৃষ্টি, উজ্জ্বল বাস্তব চরিত্ররচনা, চরিত্রগুলির সূক্ষ্ম ও ক্রমবিকাশমানতা— যা আধুনিক উপন্যাসকারের মালমসলা, সবই তাঁর সঞ্চয়ে ছিলো, কেবল যুগানুকূল্য ঘটেনি। ঙ. সহৃদয় মানবপ্রেম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটির আন্তর সৌরভ। কবিকঙ্কণের সহৃদয় লেখণীমুখে বনের পশুও মানবিক ব্যক্তিত্বে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। উদাহরণ : বীর কালকেতুর শিকারের দাপটে চণ্ডীর কাছে বনের পশুদের আকূল ক্রন্দন: ভালুক, 'বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক।/ নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক।।/সাত পুত্র মারে বান্ধি জাল পাশে।/সবংশে মজিনু মাতা তোমার আশ্বাসে।।' নানা জাতের হরিণ : 'বারশিঙ্গা তুলারু গোড়ার ঢোলকান।/ধরণী লোটায়ে কান্দে করি অভিমান।।/'কেন হেন জন্মবিধি কৈল পাপ বংশে।/জগৎ হইল বৈরী আপনার মাংসে।।'

এ যেন বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতার বহুবর্ণ কবিত্বময় ভাষার রস-মিছিল। এরই সঙ্গে যোগ হয়েছে যথার্থ শব্দ সংগ্রহ ও তাদের নিপুণ সংযোজন, অলঙ্কারের কুশলী পরিবেষণ এবং অকপট সরস ও সরল বর্ণনা শক্তির। আসলে মঙ্গলকাব্যের সুনির্দিষ্ট ও প্রথাবদ্ধতার শৃঙ্খল মুকুন্দরামের অপূর্ব নির্মাণক্ষম প্রতিভার শক্তিতে তাঁর কাব্য-বনিতার চরণে নূপুর হয়ে বেজেছে।

◆

পৌঁছে সহানুভূতির জারক রসে জারিত হয়ে দুঃখের গান হয়ে ওঠে। সেই গানের 'স্থায়ী' হলো তাঁর এই **গ্রন্থোৎপত্তির কারণ** অংশটি। এই গান থেকেই কবিকঙ্কণের বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতার বহুবর্ণময় ও কবিত্বপূর্ণ ভাষার রস-মিছিল শুরু হয়েছে।

॥২॥ মুকুন্দরামের কবিপ্রতিভা : কবির চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে তৎকৃত আত্মজীবনী থেকে জানতে পারি মোটামুটি ভাবে ১৫৯৪ থেকে ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর কাব্য রচিত হয়। মুকুন্দরামের কাব্য রচনাকালে আকবরের সুযোগ্য সেনাপতি মানসিংহ বাংলার শাসনকর্তা [১৫৯৪-১৬০৬]। এই কাব্য রচনার জন্যে কবি 'কবিকঙ্কণ' উপাধি লাভ করেন।

আমরা মুকুন্দরামকে মধ্যযুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে গ্রহণ করেছি। এই শ্রেষ্ঠত্ব-সৌধ কোথায় বা কোন উপাদানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে? **ক.** মুকুন্দরামের বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিলো অত্যন্ত ব্যাপক! তবে তিনি ঠিকাদারের মতো কেবল সেই অভিজ্ঞতা-বস্তু স্তূপ করে তোলেন নি; যথার্থ শিল্পী কারিগরের মতো সহৃদয় পরিকল্পনার দ্বারা তাকে মনোরম কাব্য-সৌধ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। নিজের ঘরেব সপত্নী-কোন্দলের বাস্তব জ্ঞান তাঁর রচনায় চমৎকারভাবে ফুটেছে। **খ.** মুকুন্দরাম জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। সেই ব্যক্তি-দুঃখ তাঁর কাব্যের পাত্রপাত্রীর মধ্যে দিয়ে অনেকবার প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কেবল নীরস দুঃখের পুঞ্জীকরণের দ্বারা বড় কবি হওয়া যাওয়া যায় না,— যদি না তা অনুভবের স্তরে পৌঁছে সহানুভূতির জারক রসে জারিত হয়ে দুঃখের গান হয়ে উঠেছে। এখানে পাঠকদের বহু পরিচিত ফুল্লরার বারমাস্যাকে এইরকম একটি সুন্দর দুঃখ-সঙ্গীতের উদাহরণ রূপে স্মরণ করতে বলি। **গ.** মুকুন্দরামের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব বাঙলা সাহিত্যে কয়েকটি অমর চরিত্র উপহার দেওয়া। 'তাঁর রচিত চরিত্রগুলি জীবন্ত। তাদের আচরণে এবং ভাষায় ধমণীর রক্তচাঞ্চল্য অনুভব করা যায়। অভিজ্ঞতার স্বর্ণদীপ হাতে কবি চরিত্রগুলির হৃদয়কন্দরের বৈচিত্র্যময় মহলে পরিক্রমণ করেছেন সমান স্বাচ্ছন্দ্যে। দৈবশক্তিতে বলীয়ান ব্যাধের স্বল্পবুদ্ধির স্থূলতা; দরিদ্র, জীবন-যুদ্ধে পরাজিত কায়স্থ সন্তানের খলতা, তরুণী খুল্লনার প্রণয়-রোমান্টিক স্বভাবের সঙ্গে গলা ছেড়ে সতীনের সঙ্গে ঝগড়া, বেণে মুরারি শীলের শাঠ্য, বৃদ্ধা দুর্বলা দাসী কর্তৃক লহনা সতীনের প্রতি উসকানি প্রভৃতি—বাংলা দেশের মধ্যযুগে অন্য কোন একজন কবির সৃজন-ক্ষমতা এত বৈচিত্র্যকে আয়ত্ত করতে চায়নি, পারেওনি। অথচ আশ্চর্য মুকুন্দরামের চরিত্রগুলির কোনো দু-জনের মধ্যে কোনো ঐক্য নেই। তাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু পরিস্থিতিগত নয়, ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতেই এই পার্থক্য। মুরারি শঠ। কিন্তু ভাঁড়ব পরিবেশে পড়লেও সে ভাঁড় হয়ে উঠতে পারতো না। ফুল্লরা ফুল্লরাই।' যেমন 'ধনপ্রাপ্তি'র পর ফুল্লরা : 'এই অঙ্গুরীর মূল্য সাত কোটি টাকা।/ফুল্লরা শুনিয়া মূল্য মুখ করে বাঁকা।। /ফুল্লরার অভিলাষ বুঝিয়া পার্বতী।/আর কিছু ধন দিতে করিলেন মতি।।' ঠিক এই প্রসঙ্গে তার স্বামী কালকেতুর আচরণ : 'মহাবীর বলে মাতা করি নিবেদন।/ চাহিয়া চিন্তিয়া দেহ এক ঘড়া ধন।। /যদি গো অভয়া ধন না দিবা অপর।/এক ঘড়া ধন মা গো নিজ কাখে কর।.../... আগে আগে মহাবীর করিল গমন।/পশ্চাতে চলিল চণ্ডী লয়ে তার ধন।। /মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি।/ঘড়া লয়ে পাছে পলায় পার্বতী।।'

উদ্ধৃত অংশে চরিত্র দুটির মনস্তত্ত্ব কোনো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না— এই অনন্য ক্ষমতা কেবল মধ্যযুগে কেন আজও দুর্লভ নয় কি? **ঘ.** ঔপন্যাসিক ক্ষমতা। মুকুন্দরাম এযুগে জন্মালে একজন দক্ষ উপন্যাসিক হতে পারতেন;— ঘটনাকে কৌশলে সাজানো, জমাট কাহিনী তৈরি,

সহজ কবিত্ব থাকার ফলে কবির কাব্য-দেহে প্রসাধনের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। ছন্দ-মিল-অলংকার সবই সাদামাঠা। রচনা সরল ও আড়ম্বরহীন। এখানে ছাগল চরানোর কাজে নিযুক্তা খুল্লনা সম্পর্কে চারিটি চরণ উদ্ধৃত হলো : 'পোড়া ধোড়া অন্ন খাই রাত্রি নিশাকালে।/ খুদিয়া মানের পাতে তিন দিকে পড়ে॥ /ছাগলে করিল লঘ্‌ঘী মাথার উপর।/ হরিদ্রার বর্ণ হইল গায়ের কাপড়॥'

১৩.খ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ॥ ১. গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ : মঙ্গলকাব্যের মতো দেব-প্রশস্তিমূলক এবং সুনির্দিষ্ট কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ সমন্বিত এই ধরনের কাব্য বোধহয় আর কোন ভাষায় প্রচলিত নেই। তাছাড়া দেব-সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক লৌকিক দেব-দেবীদের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের লড়াই-এর কথা বলতে গিয়ে সেদিনের সমাজের অনেক সত্যচিত্রও কাব্যদেহে লগ্ন হয়ে গিয়েছে। এই ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্যই মঙ্গলকাব্যগুলি সমাজ-ঐতিহাসিকদের কাছে বিশেষভাবে আলোচ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রণীত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের অন্তর্গত গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণটিকে বিচার করতে হবে।

মঙ্গলকাব্যের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ মঙ্গলকাব্য রচনার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির একটি প্রধান উপায়। কারণ, এই অংশে এই শাখার কবিরা বন্দিত দেবতার বন্দনা গান করেছেন, কারণ,—ঐ দেবতা স্বপ্নে তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন বলেই তিনি এই কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন। স্বপ্ন-লব্ধ মাদুলির মতই, এই কাব্যও প্রত্যক্ষ, শক্তিধর এবং এর পাঠ শুভদায়ক।

মুকুন্দরামের দেওয়া গ্রন্থোৎপত্তির কারণে উক্ত মাত্রা যুক্ত থাকলেও, অতিরিক্ত আর একটি তাৎপর্য এই যে, এর মাধ্যমে 'বাস্তবতা, মানবধর্ম ও সাহিত্যরস উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে, তাঁর সমগ্র কাব্যেও ব্যক্তিগত মনের ঐ ভাব-ভাবনা কিঞ্চিৎ ছড়িয়ে পড়েছে—এটি বিস্ময়ের ব্যাপার সন্দেহ নেই। কেউ কেউ অবশ্য বলেন যে, 'কবির ব্যক্তিগত কথা কাব্যে প্রতিফলিত হওয়ার জন্য কাব্যের objectivity বা বস্তুগত দুঃখ-বেদনা তাঁকে মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল করেছে, জীবনের প্রতি প্রসন্নতা সঞ্চার করেছে—গতানুগতিক সামান্য আখ্যান ও শিল্পরূপ লাভ করেছে।' এখানেই মঙ্গলকাব্যের অপরাপর কবির থেকে তাঁর মৌলিক পার্থক্য।

গণেশ বন্দনা, চণ্ডী প্রমুখের বন্দনার পরেই কবি 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' বর্ণনা করেছেন। কবির পিতার নাম হৃদয় মিশ্র। স্থানীয় ডিহিদার মামুদ সরিপের অবিচার ও অত্যাচারে কবি বর্ধমানের রত্নানদীর তীরবর্তী দামুন্যা গ্রামের সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে সামান্য একটু আশ্রয় ও জীবনধারণের উপযোগী স্বল্প কিছু বৃত্তিপ্রাপ্তির আশায় মেদিনীপুরের 'আড়রা গ্রামে' উপস্থিত হয়েছেন। এই পলায়ন, পথের ক্লান্তি ও দুর্ভোগ, এবং স্বপ্নে চণ্ডীদেবী কর্তৃক তাঁর প্রশস্তিকাব্য-রচনার নির্দেশ দান এখানে ফটোগ্রাফিক প্রত্যক্ষতায় বর্ণিত হয়েছে। ['....চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥ /করিয়া পরম দয়া/দিয়া চরণের ছায়া/আজ্ঞা দিল করিতে সঙ্গীত।']। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মুকুন্দরামে বস্তুস্তূপ হয়ে থাকেনি,—যথার্থ শিল্পী কারিগরের মতো সহৃদয় পরিকল্পনার সাহায্যে তাকে কাব্যসৌধ হিসাবে গড়ে তুলতে পেরেছেন। কবি মুকুন্দরাম জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন,—সেই ব্যক্তি-দুঃখ তাঁর কাব্যের পাত্রপাত্রীর মধ্যে দিয়ে অনেকবার উচ্চারিত হয়েছে। এর জন্য কেউ কেউ তাঁকে দুঃখ বর্ণনার কবি বলেছেন। কিন্তু কথাটি যথার্থ নয়; কারণ, কেবল নীরস দুঃখের পুঞ্জীকরণের দ্বারা বড় কবি হওয়া যায় না,—যদি না তা অনুভবের স্তরে

খ. গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে চতুর্দিকে যে মধুর প্রেম-বিগলিত ভাব এবং ভক্তির নম্রতা দেখা দিয়েছিল মঙ্গলকাব্যগুলিও তার দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হলো। গ. প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের সূচনায় গণেশাদি দেববন্দনার সঙ্গে গৌর-বন্দনাও স্থান পেল। ঘ. প্রায় তিনশো বছর পেরিয়ে গেছে। বিজয়ী মুসলমানদের সঙ্গে এখন আর সংঘর্ষের সম্পর্ক নেই, বহু ক্ষেত্রে তাদের পৃষ্ঠপোষণা পাওয়া যাচ্ছে। তাই পূর্বের মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই সম্পর্ককে যে জেহাদি মনোভাব নিয়ে উপস্থিত করার চেষ্টা হয়েছিল এখানে এসে তা শেষ হয়েছে। এখন 'মঙ্গলকাব্য রচনা একটা প্রথানুগ শিল্পরীতি হয়ে দাঁড়ালো।' ধর্মবিশ্বাসের স্থান ছোট করে এনে নিজস্ব প্রতিভার স্ফূর্তি ঘটানোর অবকাশ পেলেন এখনকার মঙ্গলকাব্যের কবিরা। ঙ. মঙ্গলকাব্যধারায় নতুন নতুন শাখার উদ্বোধন হতে থাকলো। চ. ভাবে, শৈল্পিক ঔৎকর্ষে, প্রতিভার অভিনব বিকাশে চৈতন্য-প্রভাবিত এই শতাব্দী, মঙ্গলকাব্যধারায় ঐশ্বর্যময় যুগের ফসল হিসেবে ইতিহাসে স্বীকৃতি পেয়েছে।

১৩.ক. চণ্ডীমঙ্গল : মাণিক দত্ত : ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে বিরচিত মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে বেশ ভক্তিভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে : 'মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।/যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয়॥' অতএব মুকুন্দরামের পূর্বে মাণিক দত্ত নামক জনৈক কবি চণ্ডী-মঙ্গলকাব্যের আদি প্রদর্শক।

'মুকুন্দরাম কর্তৃক মাণিক দত্তের এই উল্লেখ হইতেই কেহ কেহ তাঁহাকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করেন। মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, এই দেশের সমাজে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বেই মাণিক দত্তের কাহিনী রচিত হইয়াছিল। এ-ছাড়াও মাণিক দত্তের রচনা পৌরাণিক অনুকরণের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত দেখিয়া মনে করা যাইতে পারে যে মাণিক দত্ত মুকুন্দরামের অগ্রবর্তী, তবে একেবারে তিন শত বৎসরের অগ্রবর্তী কি না তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।'

কবির জীবন-পরিচয়ের প্রায় সবই অনুমান-নির্ভর। তবুও তাঁর নামে যে দু-একখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, তার থেকে জানা যায় যে কবি মালদহ জেলার ফুলুয়া বা ফুলবাড়ি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কাণা এবং খোঁড়া ছিলেন। এবং চণ্ডীপূজা প্রচারের শুভফলে তিনি তাঁর হারানো প্রত্যঙ্গ ফিরে পেয়েছিলেন। মাণিক দত্ত কবি অপেক্ষা ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর পালা বা পাঁচালী-গায়ক। তিনি নিজেই তাঁর মঙ্গলকাব্য গেয়ে বেড়াতেন। কথিত আছে যে চণ্ডীর গানের জন্যে কবি কলিঙ্গরাজের রোষভাজন হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, আবার ঐ চণ্ডীরই আশীর্বাদে মুক্তি পান।

কবির আবির্ভাব এবং পুঁথির প্রাচীনত্ব ও অকৃত্রিমতা বিষয়ে সংশয় তাঁর প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয়ে বাধা সৃষ্টি করেছে। তথাপি যা পাওয়া গেছে তাকে আশ্রয় করেই বলা যায় যে কবির পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার শক্তি অপেক্ষা সহজ কবিত্বই ছিলো তাঁর সম্বল। কাব্যের সূচনাতেই ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধরনে সৃষ্টিলীলার বর্ণনা সত্যই প্রশংসনীয়। বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রভাবাঞ্চল গৌড়-মালদহের কবি হিসেবে তাঁর কাব্যে গতানুগতিক গণেশাদি দেবতার বন্দনা নেই;—সৃষ্টিতত্ত্বের পরই প্রথাবদ্ধ চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী আরম্ভ হয়ে গেছে।

যেহেতু কবি নিজেই একজন পালা গায়ক, তাই তাঁর কাব্যে জনরুচির অনুকূল ছড়াবাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। চরিত্র-রচনায় তেমন মৌলিকতা না থাকলেও "ভাঁড়ুর চরিত্রটি অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্য অপেক্ষা ইহাতে গুরুত্ব লাভ করিয়াছে; তাহাকে নিছক 'ভিলেন' বলিয়াও মনে হয় না।"

মঙ্গলকাব্য

□ **১৩. বৈশিষ্ট্য :** সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে মুখে বাঙলা সাহিত্যের বিবিধ শাখার সঙ্গে এই পর্বেও বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা ও মাহাত্ম্যকীর্তনসূচক **মঙ্গলকাব্যগুলি** রচিত ও পরিপুষ্ট হতে দেখেছি। এমন কি নতুন নতুন দেবীকে আশ্রয় করে নব নব মঙ্গলকাব্যশাখারও উৎপত্তি ঘটে। সে-সব পরবর্তীপর্বে যথাযথ ভাবে আলোচিত হবে। তার আগে এই সময়ের মঙ্গলকাব্যগুলির **বিশিষ্টতা** সম্বন্ধে আলোচনা সেরে নেওয়া যেতে পারে।

আমরা এই শতাব্দীর আলোচনার মুখপাতে এ-সময়ের যুগবৈশিষ্ট্য কিভাবে বাঙলা দেশ-কালের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যকেও গড়ে-পিঠে নিচ্ছিলো তা দেখেছি। সেই যুগবৈশিষ্ট্যের প্রভাব মঙ্গলকাব্যশাখাকেও কিভাবে এবং কতখানি নিয়ন্ত্রিত করেছিলো সে সম্পর্কে সংক্ষেপে বক্তব্য হলো : **ক.** চৈতন্যদেবের সর্বব্যাপক প্রেমধর্মের প্রভাবে মঙ্গলকাব্যের দেবতারাও যোগ্য মর্যাদা পেয়ে উচ্চাসনে উঠে এলো এবং তাদের রুক্ষ রূঢ় হিংস্র ভাব বহুলাংশে অবসিত হলো।